উসমানী খিলাফাতের ইতিহাসঃ

কানুনী সুলতান সুলাইমান

প্রফেসর ডঃ ইহসান সুরাইয়্যা সিরমা

উসমানী খিলাফাতের ইতিহাস

কানুনী সুলতান সুলাইমান

অনুবাদ

বুরহান উদ্দিন

সম্পাদক

হাবিবুর রহমান

প্রচ্ছদ ও অন্যান্য

আখন্দ শরীফ সুহৃদ

প্রকাশকাল ২০১৭

ছবিঃ উসমানী খিলাফাতের পরিচায়ক চিহ্ন

মূলঃ প্রফেসর ডঃ ইহসান সুরাইয়া সিরমা

অনুবাদঃ বুরহান উদ্দিন

অনুবাদকের কথা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলিম উম্মাহকে সমগ্র মানব জাতির নেতা হিসাবে মনোনীত করেছেন। মুসলিম উম্মাহর পূর্বে এই দায়িত্ত্ব ন্যস্ত ছিল বনী ইসরাইলের হাতে কিন্তু তারা এই দায়িত্ত্ব পালন করতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে আজ এই দায়িত্ত্ব এসে পড়েছে মুসলিম উম্মাহর উপর। মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে এই দায়িত্ত্ব দিয়ে তাঁদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতী হিসাবে ঘোষণা করে দিয়েছেন। মুসলিম উম্মাহ ১৯২৩ সালে উসমানী খিলাফাতের পতনের পূর্ব পর্যন্ত তার এই দায়িত্ব পালন করেছে। বিভিন্ন সময়ে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলেও অল্প সময়ে তা কাটিয়ে উঠে নতুন করে আবার তাঁদের দায়িত্ত্ব পালন করেছে।

কানুনী সুলতান সুলাইমান ইসলামের ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লেখা তেমনি একটি নাম। তাঁর সময়ে মুসলিম শাসন ছিল তিনটি মহাদেশ জুড়ে। ঐতিহাসিকগণ বলে থাকেন মুসলিম শাসন তাঁর সময়েই সবচেয়ে বেশী অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃতি ঘটেছিল। কিন্তু আজ আমরা মুসলিম যুবকরা ইতিহাস বিস্মৃত, আমরা আমাদের সোনালী অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য ভুলে বিজাতীয়দের পেছনে ছুটে চলছি অন্ধের মত। আমাদের এই মহান মানুষগুলোকে আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বর্বর ও খারাপ মানুষ হিসাবে। আজকের যুব সমাজের ভুলকে ভাঙ্গার জন্য এবং আমাদের এই বীরদের সঠিক ইতিহাসকে যুব সমাজের নিকট তুলে ধরার জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

বুরহান উদ্দিন

২০১৭, আঙ্কারা

সূচনা

ইয়াভুজ সুলতান সেলিমের মৃত্যুর পর, মানিসাতে অবস্থানকারী শাহজাদা সুলতান সুলেইমান ইস্তানবুলে এসে তার বাবার স্থলাভিষিক্ত হন। ইস্তানবুলে ফিরে এসেই প্রথমে তিনি তার পিতার জানাযা নামাজ পড়েন এবং তাকে মির্জা সারায় নামক স্থানে দাফন করেন। পিতাকে দাফন করার পর তার পিতার রেখে যাওয়া কাজ সমুহকে দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করেন। এর মধ্যে প্রথম যে কাজটি করেন তা হল, সুলতান সেলিম মসজিদকে দ্রুততার সাথে নির্মাণ করেন।

কানুনী সুলতান সুলেইমান

ক্ষমতা অধিগ্রহনের কাজ শেষ করেই তিনি তার উজির করেন। এর পর তিনি একটি ‘ইহসান’ হিসাবে তাব্রিজ থেকে যাদেরকে বন্দী করে নিয়ে আসা হয়েছিল তাদেরকে মুক্ত করে দেন। তিনি তাদেরকে মুক্তি দিয়ে এই স্বাধীনতা দেন যে, যার ইচ্ছা সে চলে যেতে পারবে আর যার ইচ্ছা সে ইস্তানবুলে থাকতে পারবে। তার শাসনকালের শুরুতেই তার এই ন্যায়বিচার ও ন্যায়ের শাসনে মুগ্ধ হয়ে জনগণ তাকে ‘কানুনী’ উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি শুধুমাত্র ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হননি বরং তার পিতার শাসনামলে যে সকল উজিরগণ জুলুম ও অন্যায় করেছিল তাঁদেরকে তিনি শাস্তি দেন। মানুষকে জুলুম করার

জন্য ‘হুনি’ (রক্তপাতকারী) হিসাবে পরিচিত নৌ-সেনাপতি জাফর কে ফাঁসী দেন।

জানবারদির বিদ্রোহ

তিনি ক্ষমতা গ্রহন করার সাথে সাথেই যেহেতু সব কিছুকেই ঢেলে সাজাচ্ছিলেন, কোন কোন দল বা ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এটাকে একটি সুযোগ হিসাবে বেছে নিতে চান। কানুনী সুলতান সুলাইমানের এই পরিবর্তনকে মোক্ষম সময় ভেবে অনেক গভর্নর বিদ্রোহ করে বসে। ইয়াভুজ সুলতান সেলিমের শামে নিযুক্ত গভর্নর জানবেরদি গাজালীও এই সময় বিদ্রোহ করে বসেন। মূলত,তার পিতা ইয়াভুজ সুলতান সেলিমের কিছু রাজনৈতিক ও কৌশলগত ভুলের কারণে এই বিদ্রোহ আগুন জ্বলে উঠে। পূর্বেও যেমন বর্ণিত হয়েছে, জানবেরদি স্লাবিক বংশদ্ভোত একজন গোলাম। তিনি ছিলেন মামলুকি রাষ্ট্রের একজন সেনাপতি। তাঁদের সেনাপতি হয়ে তিনি উসমানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এমনকি সিনান পাশা যেই যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন সেই যুদ্ধের সকল আয়োজন তিনি সম্পন্ন করেন এবং সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এই যুদ্ধে উসমানীগণ বিজয় অর্জন করলে সে জানবেরদি সুলতান সেলিমের কাছে এসে পায়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলে সুলতান ইয়াভুজ সেলিম তাকে মাফ করে দেন। শুধু তাই নয় তাকে শামের গভর্নর নিযুক্ত করেন। ইয়াভুজ সুলতান সেলিম মৃত্যুবরণ করার পর কানুনী দায়িত্ব গ্রহণ করার প্রাক্কালে সে এটাকে একটি সুযোগ হিসাবে বিবেচনা করে এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহ করেই ক্ষান্ত হয়নি সে তার নামে খুতবা দিতে বলে এবং তার নামে মুদ্রা চালু করে।

এই খবর পাওয়ার সাথে সাথেই কানুনী সুলতান সুলেইমান সেখানে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে বিদ্রোহ দমন করেন এবং বিদ্রোহকারী জানবেরদিকে হত্যা করান।

কানুনীর সালতানাত পাশ্চাত্যে জিহাদের সেনাবাহিনী প্রেরণের মাধ্যমে শুরু হয়েছিলঃ

একথা অনস্বীকার্য যে, ইয়াভুজ সুলতান সেলিম তার পুত্র কানুনীর জন্য একটি বিশাল রাষ্ট্র ও শক্তিশালী রাষ্ট্র রেখে যান। তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তাঁর রাজ্যে কোন ধরনের সমস্যা ছিল না। কেননা ইয়াভুজ সুলতান সেলিম পূর্বে শাহ ইসমাইল ও দক্ষিনে মামলুকিদের পরাজিত করেন। তিনি উসমানী খিলাফতকে মিসর ও ইরান পর্যন্ত বর্ধিত করেন। এক অর্থে বলতে গেলে রাষ্ট্র আর শিশু প্রায় একই ধরণের। যত বড় হতে থাকে সমস্যাও সে তুলনায় বড় হতে থাকে। এই জন্যই সুলতান সেলিমের মৃত্যুর পর অনেক গভর্নর বিদ্রোহ শুরু করে। নতুন সুলতান ক্ষমতা গ্রহন করতে না করতেই বিদ্রোহ দমনের জন্য মনযোগ দিতে বাধ্য হন।

বিজয়াভিযান সমূহ

নতুন সুলতান কানুনী সুলতান সুলাইমান খিলাফাতের দায়িত্বগ্রহণ করার সাথে সাথে ইউরোপে ও পাশ্চাত্যের যে সকল দেশে জিহাদী অভিযান চলতেছিল সে গুলোকে পুনরায় অভিযান শুরু করার নির্দেশ দেন। তার প্রথম লক্ষ্য ছিল বেলগার্ড। এর আগেও বেলগার্ডকে বিজয় করার জন্য অনেক অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল কিন্তু বিজয় করতে সক্ষম হননি। এই সৌভাগ্য কানুনীর ভাগ্যেই জুটেছিল। ফলে তিনি ৩০শে আগস্ট ১৫২১ সালে বেলগার্ডকে অবরোধ করেন।

এই সময়ে তার কাছে বিভিন্ন অভিনন্দন পত্র আসতেছিল। তিনি এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে যাদের সাথে চুক্তি করা প্রয়োজন তিনি তাঁদের সাথে চুক্তি করেন আর যাদের সাথে পুরাতন চুক্তি ছিল সেগুলোকে তিনি নবায়ণ করেন।

বেলগার্ড বিজয়ের পর কানুনী সুলতান সুলাইমান রডস (Rodos) দ্বীপকে বিজয়ের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করেন। কেননা কৌশলগত দিক থেকে এই দ্বীপ

ছিল খুবই গুরত্বপূর্ণ। ফাতিহ সুলতান মেহমেদ এই দ্বীপকে বিজয়ের জন্য অভিযান পরিচালনা করেন কিন্তু তিনি সফল হতে পারেননি।

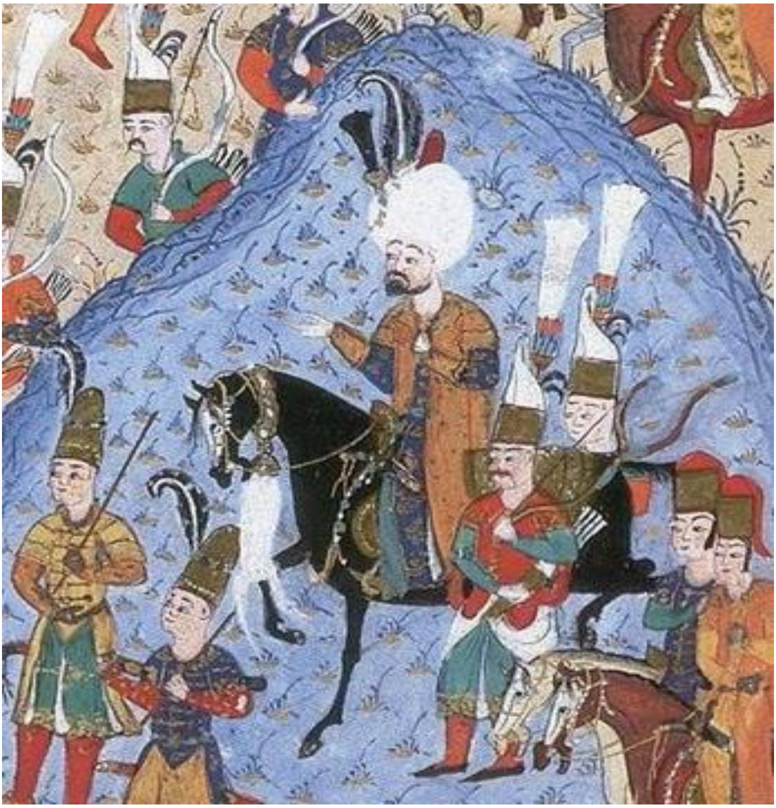

রডস দ্বীপ বিজয় অভিযানকালে

অনেক কঠিন এবং দীর্ঘ সময় ধরে চেষ্টা করার পর এই দ্বীপকে বিজয় করতে সক্ষম হন। সুযোগ পেলেই এই দ্বীপ থেকে উসমানীদেরকে আক্রমন করা হত এবং এই দ্বীপ ইউরোপিয়ানদের হাতে থাকায় তারা এখান থেকে নানান ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করত। এই জন্য কানুনী আগে এই দ্বীপকে দখল করে নেন। তিনি শোভালিয়েদেরকে পরাজিত করে এই দ্বীপের দখল নেওয়ার পর,

শোভালিয়েদেরকে গিরিতে যাওয়ার অনুমতি দান করেন। রডস দ্বীপের সমস্যা সমাধান করে তিনি ১৫২৩ সালে ইস্তানবুলে ফিরে আসেন।

গভর্নর আহমেদ পাশার বিশ্বাসঘাতকতা

কানুনী সুলতান সুলায়মান রডস থেকে ফিরে আসার পর আহমেদ পাশাকে মিশরের গভর্নর হিসাবে প্রেরন করেন। কিন্তু তিনি মিশরে গিয়েই যেন এই আয়াতের বাস্তব প্রতিফলন ঘটান।

﴿إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾

"মানুষকে ছোট মনের অধিকারী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। (মা'রিজ-১৯)"

মিশর ইস্তানবুল থেকে অনেক দূরে অবস্থিত হওয়ায় তিনি স্বাধীন সুলতান হওয়ার স্বপ্ন দেখেন এবং নিজের নামে মুদ্রা ছাপানোর পাশাপাশি তার নামে খুতবা দেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু আহমেদ পাশার সাথে পাঠানো কাজী মেহমেদ তার এই আচরণের বিরোধিতা করেন এবং উসমানী রাষ্ট্রের প্রতি তার আস্থা ও বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ করেন। ফলে তার সাথে আহমেদ পাশার দ্বন্দ শুরু হয় এবং এক যুদ্ধে বিদ্রোহী আহমেদ পাশা নিহত হয়।

আহমেদ পাশাকে হত্যা করার পরেও মিশরে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও দ্বন্দ অব্যাহত থাকে। কানুনীর কাছে এই খবর পৌঁছালে তিনি তার পারগালার উজির ইব্রাহীম পাশাকে মিশরে পাঠিয়ে সেখানে শান্তি আনয়ন করেন। এটা করার সময় যে সকল আলেমকে তার পিতা জোরপূর্বক মিশর থেকে ইস্তানবুলে নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে যারা মিশরে ফিরে যেতে চায় তাঁদেরকে মিশরে পৌঁছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং যে সকল মিশরীয় জেলে ছিল তাঁদেরকে মুক্তি দিয়ে মিশরে পাঠিয়ে দেন। কানুনীর এই পদক্ষেপকে মিশরীয়গণ খুব ভালো চোখে দেখেন এবং তার জন্য দোয়া করেন। পারগালি ইব্রাহীম পাশা ১ বছর পর্যন্ত মিশরে অবস্থান করার পর সুলতানের নির্দেশে পুনরায় ইস্তানবুলে

ফিরে আসেন। এই সময়কালের মধ্যে শাহ ইসমাইল মৃত্যু বরণ করেন এবং তার ছেলে তাহমাস্প তার স্থলাভিষিক্ত হন।

ইরানের শাহ, তাহমাস্প (Tahmasp) এর দায়িত্ব গ্রহণকে আনুষ্ঠানিকভাবে না জানানোর কারণে কানুনী তাঁদেরকে একটি চিঠি পাঠিয়ে তাঁদেরকে আক্রমণ করার হুমকি দেন।

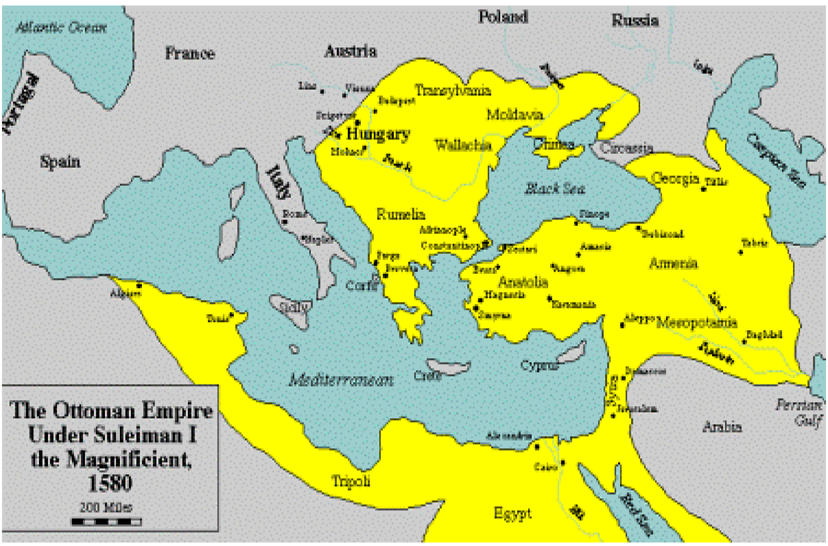

কানুনী সালতানাতের সময়কার উসমানী খিলাফাতের মানচিত্র

মোহাচ ময়দানের যুদ্ধ এবং বুদি বিজয়ঃ

কানুনীর দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই ইউরোপে পরিচালিত অভিযান সমূহের ফলে ইউরোপে এক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে হাঙ্গেরী এতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কেননা পাশ্চাত্যের রাষ্ট্র সমূহ মুসলিমদের বিরুদ্ধে সব সময় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। বিশেষ করে বেলগার্ডের পতনের পর তারা উসমানী খিলাফাতের বিরুদ্ধে নতুন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে।

কিন্তু ইউরোপীয়ানদের মধ্যেও কোন ঐক্য ছিল না। বিশেষ করে অন্যান্য ইউরোপীয়ান দেশ সমূহের সাথে ফ্রান্সের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ছিল চরমে। ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রাঞ্চচইস শারলকেনকে (I. François Şarlken) বন্ধী করে। এই অবস্থা উসমানী খিলাফাতকে অনেক সুযোগ তৈরি করে দেয় এবং তাঁদের রাজার মুক্তির জন্য ফ্রান্স, উসমানী সুলতান কানুনীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে দূত পাঠায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে কানুনী সুলতান সুলাইমান ফ্রান্সকে সাহায্য করার লক্ষ্যে এবং ইউরোপে উসমানী খিলাফাতের অবস্থানকে মজবুত করার জন্য মিশর ফেরত ইব্রাহীম পাশাকে সরদার করে ২৩ শে এপ্রিল ১৫২৬ সালে ইস্তানবুল থেকে ১ লাখ সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন । সেনাবাহিনী পাঠানোর সময় কানুনী এই নির্দেশ প্রদান করেন যে, *ফসলী জমির উপর দিয়ে যাওয়া যাবে না এবং সেখানে পশু চড়ানো যাবে না। স্থানীয়দের পশুতে হাত দেওয়া যাবে না এবং কোন ক্রমেই তাঁদের কোন কাজে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। যারা এই কাজ করবে অথবা এই কাজ করতে উদ্যমী হবে তাঁদেরকে শূলে চড়িয়ে ফাঁসী দেওয়া হবে।*

কানুনীর সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য ছিল, হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদিকে বিজয় করা। উসমানী সেনাবাহিনী যাত্রা করার ৩ মাস পর বেলগার্ডে গিয়ে পৌঁছেন। যাত্রা পথে তারা টুনার রাস্তা অনুসরণ করেন । কেননা বুদি শহরটি টুনার পাদদেশে নির্মিত হয়েছিল এবং নদীর তীর ধরে এই যাত্রা অধিকতর সহজ ছিল। কানুনীর নেতৃত্বে ১ লক্ষ উসমানী সেনাবাহিনী বুদিকে সম্মুখে যাওয়ার সময় কানুনী খবর পান যে, হাঙ্গেরী মোহাচ ময়দানে সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছে। এই খবর পাওয়ার পর তিনি মোহাচ অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ দেন।

হিলাল কৌশল (এটা উসমানীদের বিশেষ এক কৌশলের নাম)

২৯শে আগস্ট ১৯২৬ সালে উসমানী সেনাবাহিনী কানুনী সুলতান সুলাইমান ও অন্যান্য সেনাপতি- দের নেতৃত্বে মোহাচ ময়দানে এসে হাজির হয়।

হাঙ্গেরীয়ান সৈন্যরা তাঁদের সম্মুখ বাহিনীকে ময়দান ধরে রাখার জন্য এক অদ্ভুত পদ্ধতি অবলম্বন করে। এই লক্ষে তারা তাঁদের অশ্বারোহী বাহিনীকে একে অপরের সাথে শিকল দিয়ে বেধে দেয়। যাতে করে তারা যখন তাঁদের ঘোড়া নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হবে তখন যেন তাঁদের সামনে যারা পড়বে সকলকে দলিত মথিত করে অগ্রসর হতে পারে। উসমানী গোয়েন্দারা এই কথা জানার পর তারা কানুনী সুলতান সুলায়মানকে অবহিত করে। তাঁদের এই পরিকল্পনা শোনার পর কানুনী তাঁদের বিরুদ্ধে উসমানীদের বিশেষ যুদ্ধ হিলালী কৌশল (Hilal Taktiği) অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নেয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী সৈন্যরা হিলালের মত করে (নতুন বাঁকা চাঁদ) হাঙ্গেরীয়ান সৈন্যদেরকে ঘিরে ফেলে তাঁদেরকে একদম মাঝখানে নিয়ে আসবে। এর পর তাঁদের উপর অনবরত বল নিক্ষেপ করবে এবং তীর নিক্ষেপ করবে। এর পর তাঁদেরকে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করে নাস্তানাবুদ করে দিবে।

ইস্তানবুল থেকে যাত্রা করে হাঙ্গেরীতে পৌঁছতে পৌঁছতে উসমানী সেনাবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা দাড়ায় ৩ লক্ষে। কেননা যাত্রা পথে অনেকেই উসমানী বাহিনীতে যোগ দেয়। আর হাঙ্গেরী সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৫০ হাজার।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে কানুনী সুলতান সুলেইমান আকাশের দিকে হাত তুলে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে এই দোয়া করেনঃ

"...ইলাহী, হে প্রভু! সকল শক্তি এবং ক্ষমতার মালিক তুমি। সকল সাহায্য এবং সুরক্ষা তোমার পক্ষ থেকে। হে আল্লাহ তুমি উম্মতে মুহাম্মদীকে সাহায্য কর।"

১৫২৬ সালে ২৯ শে আগস্ট আসরের পর বহুল প্রত্যাশিত সেই যুদ্ধ শুরু হয়। সেই সময়ে উসমানী বাহিনীর সেনাপতিত্ত্বে ছিলেন পারগালী ইব্রাহীম পাশা। এই সময়ে হাঙ্গেরীয়ান বাহিনী প্রবল বেগে উসমানী বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্র থেকে যুদ্ধ পরিচালনাকারী মূল সেনাপতি কানুনী সুলতান সুলেইমানের উপরে আক্রমণ করা। হাঙ্গেরিয়ান শত্রুরা আক্রমণ

করার সাথে সাথেই উসমানী সেনাবাহিনী তাঁদের যুদ্ধ কৌশলের অংশ হিসাবে পিছু হটেন এবং এটাকে সুযোগ মনে করে হাঙ্গেরীয়ান বাহিনী ভেতরে ঢুঁকে পড়ে। এর পর উসমানী বাহিনী প্রথমে পাশে থেকে পরে পেছন দিক থেকে ঘিরে ফেলে তাঁদের উপর আগুনের গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। হাঙ্গেরীয়ান বাহিনী কিছু বুঝে উঠার আগেই এক ভয়াবহ আক্রমণের মুখোমুখি হয়ে পালাতে শুরু করে। উসমানীদের আক্রমনে নাস্তানাবুদ হয়ে অনেকেই নিহত ও আহত হয়। হাঙ্গেরীয়ান রাজা দ্বিতীয় লাজসকে এক গর্তে মৃত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যায়। এই যুদ্ধ দুই ঘণ্টা স্থায়ী হয়। যে সকল হাঙ্গেরীয়ান সেনা কোনভাবে প্রানে বাঁচতে সক্ষম হয় তারাও অন্ধকারে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এইভাবে মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে এক বড় বিজয় দান করেন।

কানুনী সুলতান সুলাইমান এই যুদ্ধের পর তার সৈন্যদেরকে ৩ দিন বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ দান করেন। এরপর তারা বুদিনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। খ্রিষ্টানরা তাঁদের সেনাবাহিনীর এই ভয়াবহ পরাজয় এবং তাঁদের রাজার মৃত্যুর কথা শুনে শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়। শহরের দায়িত্বে থাকা ইয়াহুদি নেতা সালামন ইয়াসেফ কোন প্রকার প্রতিরোধ না করে শহরের চাবি কানুনীর হাতে সমর্পণ করেন।

এই ভাবে কোন প্রকার রক্তপাত ছাড়াই বুদিনকে মুসলিমগণ বিজয় করতে সক্ষম হন। কানুনী এখানে ১৪ দিন অবস্থান করার পর, ইস্তানবুলে ফেরার পথে আরও অনেক কেল্লাকে বিজয় করে ইস্তানবুলে ফিরে যান। এর পর যে সকল হাঙ্গেরীয়ান তার কাছে আশ্রয় চান, তিনি তাঁদেরকে ওয়াদা দেন যে, তিনি তাঁদেরই মধ্য থেকে যাপলিয়া নামক একজনকে রাজা হিসাবে নিয়োগ দিবেন।

এনাতোলিয়ার বিদ্রোহ

কানুনী সুলতান সুলাইমান অভিযানে থাকার সময়, তার অনুপস্থিতিতে এনাতোলিয়ার কিছু গভর্নর বেশী কর আদায় করে। এটাকে পুঁজি করে ফুলিয়ে

ফাপিয়ে অনেক অঞ্চলের জনগণ বিদ্রোহ করে বসে। এই বিদ্রোহীদের অধিকাংশই ছিল তুর্কমেন। তারা সুউন খোজা নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সুলতান সুলেইমান এই খবর পাওয়ার সাথে সাথেই তার কিছু বিশ্বস্ত পাশাকে পাঠান বিদ্রোহ দমন করার জন্য। তারা অতি অল্প সময়েই এই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন।

১৫২৭ সালে আদানা এবং তারসুসে এই বিদ্রোহ শুরু হয়। এই বিদ্রোহ দমন করার পর আদানায় 'ওলী খালিফা' নামক আরেকটি বিদ্রোহ নতুন করে শুরু হয়। এই সকল বিদ্রোহ দমন করার পরেও এনাতোলিয়াতে শিয়া ও তুর্কমেনদের বিদ্রোহ চলতেছিল। পরবর্তীতে এই সকল বিদ্রোহকে দমন করার জন্য কানুনী সুলতান সুলেইমান তার বড় সেনাপতি ইব্রাহীম পাশাকে পাঠান। ইব্রাহীম পাশা এই দায়িত্ব পাওয়ার পর তিনি সেখানে এসে এই বিদ্রোহকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করেন। কিন্তু এর এক বছর পর পুনরায় আদানাতে আর একটি বিদ্রোহ শুরু হয়। এই বিদ্রোহ পরে পিরি বেয় নামক সেনাপতি নির্মূল করেন।

প্রথম ভিয়েনা অবরোধঃ

বুদিনকে দখল করার পর কানুনী সুলতান সুলেইমান যাপলইয়াকে হাঙ্গেরীর রাজা হিসাবে ঘোষণা করেন। তার এই ঘোষণা উসমানী এবং হাঙ্গেরীয়ানদের মধ্যকার সম্পর্ককে শক্তিশালী করে। অপরদিকে হাঙ্গেরীয়ান রাজা ফারদিনান্দ তার নিজের ক্ষমতাকে স্থায়ী করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। এই সমস্যা সমাধানের জন্য এবং বন্ধু রাষ্ট্র ফ্রান্সকে জার্মানিদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কানুনী পুনরায় যুদ্ধ যাত্রা করেন। কেননা ফ্রান্সিসরা বার বার উসমানীদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছিল।

কনুনী যুদ্ধ যাত্রা করার পূর্বে তার উজীরে আজম ইব্রাহীম পাশাকে অনেক বড় দায়িত্ব দেন। তাকে তিনি এমন ক্ষমতা দেন যে, সে প্রায় খলিফার পদমর্যাদা সমপন্ন হয়ে যায়।

কানুনী সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পরে ১০ মে ১৫২৯ সালে, দুই লক্ষ সৈন্য নিয়ে ইস্তানবুল থেকে বুদিনের উপর দিয়ে যাত্রা করেন। উসমানী বাহিনী ১৯শে আগস্ট হাঙ্গেরীতে গিয়ে পৌঁছে। কানুনী তার বাহিনী নিয়ে হাঙ্গেরীতে পৌঁছার পর, যাপলিয়া তার কাছে এসে তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে তার নতুন দায়িত্ব শুরু করে। সেখানে কানুনী তার বাহিনীসহ ছয়দিন পর্যন্ত অবস্থান করেন। বুদিনের রাজপ্রাসাদে যাপলিয়াকে হাঙ্গেরীর রাজা হিসাবে ঘোষণা দিয়ে ভিয়েনায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, উসমানী বাহিনী যখন ইস্তানবুল থেকে যাত্রা করেছিল তখন জানত না যে, তারা ভিয়েনার উপর দিয়ে যাবে। অর্থাৎ ভিয়েনা অবরোধের সিদ্ধান্ত বুদিনে থাকা অবস্থায় নেওয়া হয়। ভিয়েনার উপর দিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল সেখানে আশ্রয় গ্রহণকারী ফারদিনান্দকে গ্রেফতার করা। কিন্তু ভিয়েনায় যাওয়ার পর জানতে পারেন যে, ফারদিনান্দ ভিয়েনা থেকে পালিয়ে অষ্ট্রিয়াতে আশ্রয় নিয়েছে।

২৭ শে জুলাই উসমানী বাহিনী ভিয়েনায় পৌঁছে সিম্মেরিং নামক অঞ্চলে তাবু স্থাপন করে। সেখান থেকে অবরোধ পরিচালিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এইভাবে অবরোধ করে ভিয়েনার কেল্লাকে কয়েক দফা সর্বাত্মক আক্রমণ করার পরেও শক্তিশালী প্রতিরোধের কারণে কোন ফলাফল পাওয়া যায়নি। অক্টোবর মাস শুরু হতেই ভিয়েনার বিখ্যাত ঠাণ্ডা শুরু হয়ে যায়। একই সাথে বৃষ্টির সময়ও শুরু হয়ে যায়। পদাতিক সৈন্যরা এই বৃষ্টির নিচেই যুদ্ধ করতে থাকেন।

উসমানী সেনাবাহিনী ভিয়েনা অবরোধের পরিকল্পনা আগে না করার কারণে তারা ভারী বল নিয়ে আসেনি। কেননা এই অবরোধের সিদ্ধান্ত রাস্তায় থাকা অবস্থায় নেওয়া হয়েছিল। বৃষ্টি এবং অত্যধিক ঠাণ্ডার কারণে সৈন্যরা কাঁপতে

থাকে এবং পশুদের জন্য কোন চারন ভুমিও পাওয়া যাচ্ছিল না। অক্টোবর মাসে ভিয়েনার আবহাওয়া অত্যধিক ঠাণ্ডা হত। এই ঠাণ্ডার উপযুক্ত তাবু নিয়ে যুদ্ধ করতে বের হওয়ার ফলে সৈন্যদের পক্ষে যুদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। যার ফলে এই অবরোধ ২১ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয় কিন্তু কোন ফলাফল আনতে পারেনি।

কানুনী যখন বুঝতে পারেন যে, এই অবস্থায় এবং এই আবহাওয়ায় যুদ্ধ করে কোন ফলাফল বয়ে আনা সম্ভব নয়, তখন তিনি তার কমান্ডারদেরকে অবরোধ প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেন এবং ইস্তানবুলে ফিরে যাওয়ার সিধান্ত নেন।

কানুনী ইস্তানবুলে ফিরে আসার পর পরবর্তী গ্রীষ্মকালে ইস্তানবুলে শিশুদের জন্য "সুন্নতে খৎনা" র আয়োজন করেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে এই অনুষ্ঠানে উসমানী রাষ্ট্রের বিভিন্ন গভর্নরগণ ও অন্যান্য দেশের রাজাগণও দাওয়াত প্রাপ্ত হন। এই অনুষ্ঠানে এত বেশী পরিমানে হাদিয়া আসে যে, যা গননা করা অসম্ভব হয়ে দাড়ায়।

কানুনীর হাঙ্গেরী ও জার্মানী অভিমুখে যাত্রাঃ

কানুনী সুলতান সুলেইমান ইস্তানবুলে ফেরার পরেই রাজা ফারদিনান্দ জার্মানদের সাহায্য নিয়ে পুনরায় বুদিনে আক্রমণ করে। এই আক্রমনে রাগান্বিত হয়ে কানুনী পুনরায় প্রস্তুতি নিয়ে হাঙ্গেরীয়ান ও জার্মানদেরকে শায়েস্তা করার জন্য তাঁদের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। কানুনী তার বাহিনী নিয়ে বেলগার্ডে পৌঁছলে, ফারদিনান্দ তার নিকটে দূত পাঠায়। তিনি দূত মারফত কানুনীকে বলেন যে, তাকে যদি হাঙ্গেরীর রাজা বানানো হয় তাহলে তিনি উসমানী খিলাফাতকে ট্যাক্স দিবেন এবং তাঁদের নেতৃত্বকে স্বীকার করে নিবেন। কিন্তু কানুনী তার এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করেন এবং তার যাত্রা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু জার্মান সাম্রাজ্য ভয়ে কোন প্রকার প্রতিরোধ গড়ে না তোলায় তিনি বিনা বাঁধায় অনেক নতুন দুর্গ ও শহর বিজয় করে ইস্তানবুলে ফিরে

আসেন। পরবর্তীতে ইরানের রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তন হওয়ায়, উসমানী খিলাফাত ফারদিনান্দের প্রস্তাবকে গ্রহণ করে চুক্তি স্বাক্ষর করে।

এনাতোলিয়ার বিদ্রোহ এবং "ফাতহ-ই-ইরাকাইন" অভিযান

কানুনী সুলতান সুলাইমান যখন ইউরোপ অভিযান নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তখন তার অনুপস্থিতিকে সুযোগ ভেবে কিছু গ্রুপ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে ছিল ইরানের সাফাবি রাষ্ট্রের সাথে একাত্বতা ঘোষণাকারী আলেবি গণ। এই বিদ্রোহসমূহ ছাড়াও আরও কিছু বিদ্রোহ দানা বেধে উঠেছিল। সে সময়ে কানুনী মোহাচ অভিযানে ছিলেন। কানুনী যখনই পাশ্চাত্য অভিমুখে কোন অভিযানে বের হতেন তখনই নতুন নতুন বিদ্রোহ দানা বেধে উঠত। ফলে তিনি ফিরে এসেই বিদ্রোহ দমনের জন্য সেনাবাহিনী পাঠাতে বাধ্য হতেন। খুবই আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, উসমানী খিলাফাত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হয়তবা পাশ্চাত্যের হাঙ্গেরিয়ানদের সাথে অথবা প্রাচ্যের ইরানি শিয়াদের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন। এক সমস্যা সমাধান করার আগেই আরেক নতুন সমস্যার জন্ম নিত।

এই সমস্যাকে সমাধান করার জন্য কানুনী সুলতান সুলায়মান হাঙ্গেরী অভিযান থেকে ফিরে আসতে না আসতেই উসমানী খিলাফাতের ইতিহাসে "ফাতহ-ই-ইরাকাইন" নামক প্রসিদ্ধ অভিযানে বেরিয়ে পড়েন। এই অভিযানে কানুনীর সাথে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও চিত্রশিল্পী মাত্রাকচি নাসুহও অংশগ্রহন করেন। যাত্রা পথে তিনি গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের বর্ণনা দিতেন এবং এগুলোকে ছবি একে সবার সামনে তুলে ধরতেন।

কানুনী সুলতান সুলাইমান এনাতলিয়ার দায়িত্ত্ব তার পুত্র মুস্তাফার হাতে অর্পণ করে, কুতাহইয়া দিয়ে কনিয়ায় পৌঁছান। সেখানে তিনি যাত্রা বিরতি করে কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির মাজার যিয়ারত করেন। এরপর তিনি যাত্রা করে যুদ্ধে অংশগ্রহন করেন। এর পর তিনি

এরজিনযান ও এরজুরুম হয়ে নতুন বিজিত হওয়া এরচিশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ২০শে সেপ্টেম্বর তিনি তাব্রিজে পৌঁছালে জনগণ তাকে এক বিশাল সমাবেশের মাধ্যমে বরণ করে নেয়। তাব্রিজে পৌঁছার পর প্রচণ্ড শীতকে উপেক্ষা করে তিনি তার যাত্রাকে অব্যাহত রাখেন এবং কাসর-ই শিরিনে পৌঁছান।

কানুনী সুলতান সুলাইমান তার উজিরে আজম ইব্রাহীম পাশাকে বাগদাদে পাঠান। এরপর তিনি নিজে শহরে প্রবেশ করেন। বিশাল বাহিনী নিয়ে প্রবেশকারী কানুনী সুলতান সুলাইমান প্রথমে ইমাম আজম আবু হানিফার মাজারে যান এবং তার কবর যিয়ারত করেন। কানুনী সুলতান সুলাইমান বাগদাদে তার অবস্থানকে শক্তিশালী করার পর, পত্র মারফত তার অবস্থানকে সকল জায়গায় জানিয়ে দেন।

এই শীতকালীন সময়ে কানুনী ৪ মাস পর্যন্ত বাগদাদে অবস্থান করেন এবং এই সময়ে বাগদাদ এবং তার আশেপাশের সকল এলাকার প্রশাসনকে ঢেলে সাজানোর পাশাপাশি প্রশাসনকে মজবুত করেন। এর পাশাপাশি ইমামে আজম আবু হানিফা এবং শায়খ আব্দুল কাদির জিলানীর কবরকে বাঁধায় করেন। বাগদাদে অবস্থাকালে কারবালা সহ অনেক গুরত্বপূর্ণ স্থান যিয়ারত করেন।

বাগদাদের সকল কাজকে এইভাবে সমাধান করার পর ইস্তানবুলে ফেরার সময় তিনি তাব্রিজে যান। এই সময়ে তাহমাস্পের ভাই সাম মির্জা তাব্রিজে এসে কানুনীর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফেরার পথে কানুনী মেরেন্দ-হয় থেকে এরচিশ হয়ে আদিলজেওয়াজে যান। সেখান থেকে আহলাত, দিয়ারবাকের এবং হালেপ হয়ে ইস্তানবুলে ফিরে আসেন। এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, কানুনী কক্ষনোই তার সিংহাসনে বসে থাকতেন না। তিনি সব সময় অভিযানে বের হতেন। মূলত তাকে একজন মহান ও বড় সুলতান করার পেছনে মূল কারণও ছিল এটাই।

একটি ভুল-বোঝাবুঝি

শান্তি প্রক্রিয়ার সময়কে কাজে লাগিয়ে উজিরে আজম ইব্রাহীম পাশা ফ্রান্সের সাথে কিছু অর্থনৈতিক চুক্তি করেন। উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক দিক থেকে সাম্রাজ্যকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরও বেশী শক্তিশালী করে তোলা এবং রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে বড় করা। ফলশ্রুতিতে ১৫৩৬ সালে (কারো কারো মতে ১৫৩৫ সালে) উসমানী খিলাফাত রাষ্ট্রের সাথে ফ্রান্সের দ্বিপাক্ষিক স্বার্থের ভিত্তিতে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী উভয় দেশের নাগরিকরা উভয় দেশে ভ্রমনের, ব্যবসা করার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুযোগ পাবে।

এই চুক্তির ফলে কানুনীর সমালোচনা করলেও, আমাদের মতে এই সমালোচনার মূল কারণ হল, চুক্তিটিকে ভালোভাবে না বুঝা। যদিও বলা হয়ে থাকে যে এই চুক্তির মাধ্যমে ফ্রান্সিসদেরকে বেশী সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। আসলে তা নয়, উভয় দেশই সমান সুযোগ সুবিধা পেয়েছিল। তবে ফ্রান্সিসরা তাঁদের এই সুযোগকে ভালোভাবে কাজে লাগতে পারলেও উসমানীগণ এটাকে কাজে লাগাতে পারেননি। এই ক্ষেত্রে সুলতানকে দোষারূপ না করে সেই সময়ে বণিকগোষ্ঠী ও যারা এই সকল কাজে নিয়োজিত ছিল তাঁদের ভুল হিসাবে দেখতে হবে।

শায়খুল ইসলাম হযরত যামবিল্লি আলী (রঃ) এর মৃত্যুঃ

উসমানী খিলাফাতের বিশেষ করে ইয়াভুজ সুলতান সেলিমের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ নেওয়ার ক্ষেত্রে বড় ভুমিকা পালন কারী যামবিল্লি আলী (র:) ১৫৩৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। ইয়াভুজ সুলতান সেলিমের মিশর ও ইরান অভিযানের ফতওয়াও এই শায়খুল ইসলামই দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় তার সাহসী সিদ্ধান্ত ও ফতওয়ার ফলে তিনি পরওয়াহীন বলে পরিচিত ছিলেন। মুসলমানদের উপর অভিযান পরিচালনা যাবে কি যাবে না এই বিষয়ে তার যে

ফতওয়া ছিল এই ব্যাপারে বহু বিতর্ক থাকলেও ইয়াভুজ সুলতান সেলিমের অনেক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তিনি হস্তক্ষেপ করতেন। তার এই সকল বিষয় দেখলেই বুঝা যায় তিনি তৎকালীন খলিফা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন না।

যামবিল্লির মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হন ইবনে কামাল। তিনিও তার পূর্বসুরীর মত জ্ঞানে ছিলেন পরিপূর্ণ একজন আলেম।

উজিরে আজম ইব্রাহীম পাশার সমাপ্তি

ইব্রাহীম পাশা দীর্ঘ ১৪ বছর কানুনী সুলতান সুলাইমানের উজিরে আজম হিসাবে দায়িত্বপালন করেন। কিছু সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে সুলতান তাকে ফাঁসী দেওয়ার নির্দেশ দেন। ইব্রাহীম পাশার ফাঁসির পর আয়াস মুহাম্মেদ পাশাকে কানুনী তার উজিরে আজম হিসাবে নিয়োগ দেন।

উসমানীদের সাগরের উপর আধিপত্যঃ

কানুনী সুলতান সুলাইমান ছিলেন একজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সুলতান। এই জন্য তিনি নৌ-শক্তির উপর ব্যাপক গুরুত্বারোপ করেন। সেই সময়ের বিখ্যাত নাবিক বারবারসকে ইস্তানবুলে আমন্ত্রণ করে তাকে 'Beylerbeyi' উপাধিতে ভূষিত করে, সে যেভাবে চায় সেভাবে যেন জাহাজ নির্মাণ করতে পারে এই জন্য তাকে সকল ধরণের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়।

কানুনী ইরাকাইন অভিযান থেকে ফিরে এসে 'খাইরুদ্দিন' নামে ভূষিতকারী বারবারসকে কাপ্তান পাশালিক নাম দেন এবং তাকে ইতালির সমুদ্রতীরে প্রেরন করেন। আলজেরিয়ার অধিবাসী বারবারস খাইরুদ্দিন পাশাকে সমগ্র ইউরোপ খুব ভালোভাবেই জানত এবং তাকে ভয় করত। উসমানী খিলাফাতের নৌবাহিনী ভূমধ্য সাগরের অনেকগুলো যুদ্ধে বিজয় লাভ করে এবং কানুনীর

আভলনিয়া (Avlonya) অভিযানের সময় এজিয়ান সাগরের অনেকগুলো দ্বীপকে বিজয় করে।

সাগরে এই সকল অভিযান যে সকল বড় ফলাফল বয়ে এনেছিল তার মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল প্রেভেযেতে অর্জিত বিজয়। ২৭ শে সেপ্টেম্বর ১৫৩৮ সালের এই সমুদ্র যুদ্ধে উসমানী খিলাফাতের সেনাপতি বারবারস খাইরুদ্দিন পাশা, অ্যান্ডেরা দরিয়ার (Andera Doria) শত্রু বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে দেয়।

পর্তুগিজরা লোহিত সাগরের তীরবর্তী মুসলমানদেরকে হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি মুসলমানদের পুণ্যভুমি হারামাইন শরীফকে (মক্কা ও মদিনা) ধ্বংস করে দিবে বলে হুমকি দেয়। তাঁদের এই হুমকির জবাবে কানুনী সুলতান সুলাইমান ১৫৩৮ সালে তার মিশরের গভর্নর হাদিম সুলাইমানকে পাঠান তাঁদের এই দুঃসাহসকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য। অতীতে ভারতীয় মুসলমানদেরকে হুমকি প্রদানকারী পর্তুগিজদেরকে উসমানী নৌবাহিনী যেভাবে সালমান রইসের নেতৃত্বে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিল, এবারও তারা হাদিম সুলাইমানের নেতৃত্বে লোহিত সাগরের তীরবর্তী মুসলমানদের এবং হারামাইন শরীফের নিরাপত্ত্বা নিশ্চিত করে ইস্তানবুলে ফিরে আসেন।

ইউরোপের সাথে সম্পর্ক

১৯৪০ সালে কানুনী সুলতান সুলাইমান উসমানী খিলাফাতের সাথে শত্রুতাপোষণকারী ভেনেডিক্টদের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পন্ন করার পর পুনরায় হাঙ্গেরীতে অভিযান পরিচালনার লক্ষে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেন। এইবার অভিযানের কারণ ছিল উসমানী খিলাফাতের নিয়োগকৃত গভর্নর যাপলিয়াকে ফারদিনান্দের মেনে না নেওয়া এবং নিজেকে হাঙ্গেরীর একমাত্র রাজা দাবী করা। শুধু তাই নয়, যাপলিয়া ১৫৪১ সালে মৃত্যুবরন করলে ফারদিনান্দ বুদিনে গিয়ে বুদিনকে অবরোধ করে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৫৪১ সালের জুন মাসে কানুনী সুলতান সুলাইমান তার উজিরে আজম হাদিম সুলাইমান পাশাকে ইস্তানবুল রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে এবং শাহজাদা মুস্তাফাকে সারুহান থেকে আমাসিয়া সানজাক বেয়লিয়ে পাঠিয়ে তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে বুদিনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কানুনী ২৬শে আগস্ট বুদিনের কাছাকাছি পেশ্তে পৌঁছেন। তিনি যখন সেখানে পৌঁছান তখন খবর পান যে, সেখানে অবস্থানকারী উসমানী সেনাবাহিনী বুদিনকে হাঙ্গেরীয়ানদের থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি এই সফলতায় অনেক বেশী খুশি হন এবং তাঁদের সেনাবাহিনীদেরকে নিয়ে উৎসব করেন। এরপর তিনি বুদিন প্রদেশকে পুনরায় সজ্জিত করেন।

১৫৫৩ সালে বারবারস খাইরুদ্দিন পাশা ফ্রান্সিসদেরকে সাহায্য করার জন্য বিশাল এক নৌবহর নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। বারবারস তার নৌবাহিনী নিয়ে মারসিলিয়াতে পৌঁছালে, ফ্রান্সিসরা তাঁদেরকে বিশাল এক গণসংবর্ধনা প্রদান করে। কেননা বারবারস তাঁদেরকে স্প্যানিশ এবং ইতালিয়ানদের থেকে মুক্ত করার জন্য এসেছেন। মারসিলিয়াতে কিছুকাল অবস্থান করার পর, তার নৌবহরের সাথে যোগদানকারী ফ্রান্সিস নৌবহর সমূহ সহ নিস শহরকে দখল করার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। দীর্ঘ অবরোধের পর যখন নিস শহর তাঁদের দখলে চলে আসছে, সেই সময়ে বারবারস ফ্রান্সিস বাহিনীর অনীহা ও অবহেলাকে লক্ষ্য করে অবরোধকে তুলে নেন।

কিন্তু এর পরে বারবারস খুব ভালো একটি কাজ করেন। ১৪৯২ সালে স্প্যানিশদের এঙ্গিজিসিয়ন (Engizisyon) গণহত্যার পর হাজার হাজার আন্দালুসিয়ান মুসলমান বিভিন্ন পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহন করেন। উসমানী খিলাফত এই সকল মুসলমানদেরকে স্প্যানিশদের জুলুম থেকে মুক্ত করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিল। অবশেষে বারবারস এই হাজার হাজার মুসলমানকে মুক্ত করে ১৫৪৪ সালে ইস্তনাবুলে নিয়ে আসেন। আমরা পূর্বেও যেমন বর্ণনা করেছি যে, ইয়াভুজ সুলতান সেলিমের সময় ভুমধ্য সাগরের আধিপত্য যাদের হাতে ছিল তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত দুই জন নাবিক ছিলেন তারা

হলেন অরুচ ও হিজির নামক ২ ভাই। এই দুই ভাই তাঁদের শক্তিকে বৃদ্ধি করতে করতে অবশেষে আলজেরিয়াকে দখল করে নেয় এবং সেখানে তারা স্বাধীন একটি হুকুমদার প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু স্থানীয় আলেজেরিয়ানগণ এবং আলজেরিয়ার বিপরীত পাশে সাগরের ওপাড়ে অবস্থিত স্প্যানিশগণ আলজেরিয়াতে তাঁদের এই আধিপত্যকে মেনে না নিয়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। দুই ভাইয়ের মধ্যে অরুচ মৃত্যুবরণ করলে অপর ভাই হিজির উপলব্ধি করেন যে তার পক্ষে একা লড়া সম্ভব নয়। তাই তিনি উসমানী খিলাফাতের নৈকট্য লাভের চেষ্টা চালান এবং ইস্তানবুলে উপঢৌকন প্রেরণ করেন। তার এই আচরণে খুশি হয়ে ইয়াভুজ সুলতান সেলিমও তাকে সাহায্য করেন। স্প্যানিশরা অরুচকে এবং তার ভাই হিজিরকে বারবারস নামে অভিহিত করত। অরুচের মৃত্যুর পর হিজির উসমানী খিলাফাতের সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং সাগরে উসমানীদের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য সাহায্য সহযোগিতা করে। তার এই সাহায্যের স্বকৃতিস্বরূপ উসমানীগণ তাকে কাপ্তান-ই-দরিয়া উপাধিতে ভূষিত করে। পরবর্তীতে খাইরুদ্দিন নামে পরিচিত বারবারস, স্পেনের তীরবর্তী পাহাড়ে অবস্থানকারী খৃস্টানদের দ্বারা মাজলুম নির্যাতিত লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে উদ্ধার করে তার নিজের জাহাজ দিয়ে আলজেরিয়াতে নিয়ে আসে।

এস্টারগনের যুদ্ধ (Estergon War)

উসমানী খিলাফাতের নৌবহর একদিক থেকে ভুমধ্য সাগরের আধিপত্য নেওয়ার চেষ্টায় ছিলেন অপর দিকে কানুনী সুলতান সুলাইমান তার সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করে **১৫৪৩** সালে এস্টারগনের দিকে যাচ্ছিলেন।

টুনা উপকুল এবং বুদিনের নিরাপত্তার জন্য এস্টারগণ দুর্গের গুরুত্ব ছিল অনেক। এই জন্য সেটাকে দখল না করা পর্যন্ত উসমানীদের হাতে থাকা

বুদিনের নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। কানুনী এটা খুব ভালো করেই জানতেন। যার ফলে তিনি তার সৈন্য বাহিনী নিয়ে সে দিকে যাত্রা করেন।

এস্টারগন যুদ্ধের একটি চিত্র

এস্টারগন দুর্গ সত্যিকার অর্থেই খুবই শক্তিশালী এবং কৌশলগত দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকায় বিজয় করা খুব দুরহ ছিল। কানুনী দুর্গে আঘাত হানার পূর্বে দুর্গে অবস্থিত জন সাধারণের উদ্দেশ্যে বলেন যে, যদি তারা আত্মসমর্পণ করে বের হয়ে আসে তাহলে তিনি তাঁদেরকে নিরাপত্ত্বা দিবেন। কিন্তু দুর্গের অধিপতিগণ এই প্রস্তাব গ্রহণ না করায় তিনি দুর্গে আঘাত হানেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই দুর্গের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন। এস্টারগনের বিজয় শুক্রবারের দ্বীনে সম্পন্ন হয়েছিল। এই জন্য কানুনী জুমার নামাজ তার বাহিনী নিয়ে দুর্গের ভেতরেই আদায় করেন এবং এরপর দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থিত গির্জাকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন।

এস্টারগণ দুর্গের বিজয়ের পর কানুনী বুদিনে ফিরে আসেন এবং সেখান থেকে বেলগার্ডে যান। সেখান থেকে ইস্তানবুলে ফেরার পথে পথিমধ্যে খবর পান যে,

তার পুত্র মেহমেদ মৃত্যুবরণ করেছে। কানুনী তার এই সন্তানকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি ইস্তানবুলে ফিরে এসেই তার সন্তানের লাশকে ইস্তানবুলে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন এবং তাকে শাহজাদেবাসীর হাযিরেসিনে দাফন করেন। ১৫৪৬ সালে কানুনীর বিখ্যাত নৌসেনাপতি ও ভুমধ্য সাগরকে উসমানীদের সাগরে পরিনতকারী কাপ্তান-ই দরিয়া বারবারস খাইরুদ্দিন পাশা মৃত্যুবরণ করেন। এবং তাকে বেশিকতাশে দাফন করা হয়।

তাবরীজ অভিযান

উসমানী রাষ্ট্র সর্বদাই ফ্রান্সকে ভালোচোখে দেখত। কিন্তু ফ্রান্স উসমানী রাষ্ট্র সম্পর্কে প্রায়ই কু-ধারণা পোষণ করত। এদিকে অষ্ট্রিয়া/ হাবসবারগের রাজার সাথে দ্বন্দ্ব -সংঘাত চলমান ছিল। বলা যায় যে, উসমানীদের সাথে সবচেয়ে দীর্ঘসময় যে রাষ্ট্রটি দ্বন্দ্ব- সংঘাতে লিপ্ত ছিল তা ছিল অষ্ট্রিয়া। কেননা উসমান পরিবারের মত সেখানেও হাবসবারগ (Habsburg) পরিবার দীর্ঘ সময় ধরে অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা ছিল। তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যুদ্ধ করেছে আবার শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শান্তি চুক্তি করেছে। ১৫৪৭ সালে উসমানী রাষ্ট্রের সাথে অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের ৫ বছর ব্যাপী একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি মতে অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্য উসমানী রাষ্ট্রকে প্রতিবছর ৩০,০০০ স্বর্ণ মুদ্রা দিবে। এই চুক্তি করে ইউরোপ থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে কানুনী ১৫৪৮ সালে ইরানের সাথে সমস্যা সমাধানের দিকে নজর দেন। ইরান অভিযানে বের হওয়ার পূর্বে কানুনী তার অতি স্নেহের ইরানিয়ান শাহজাদা আলকাস মীর্জাকে সিমান্তে পাঠান। ইরানের এই শাহজাদা ছিল কানুনীর একজন মুসাফির। তিনি তাকে তার পাশেই রাখতেন। কানুনী আলকাস মীর্জাকে উপঢৌকন দেন। যদিও এটা অনেক সমালোচনার জন্ম দেয়। কিন্তু কানুনী এই সবে কান না দিয়ে বলেন যে, তিনি সকল হিসাব মহান আল্লাহর কাছেই দিবেন। উপরের ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, শাহ এর সাথে সম্পর্ক ভালো ছিল না বলেই আলকাস মীর্জা উসমানী রাষ্ট্রের কাছে আশ্রয় নেন।

তাকে সীমান্তে পাঠানোর কিছুকাল পরেই কানুনীও এক বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে ইরানে যাত্রা করেন। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, কানুনী তার এই সফরে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতকেও সাথে নিয়ে যান। কানুনী সিবাসে পৌঁছালে, আমাসিয়া সাঞ্জাক বেয়ে শাহজাদা মুস্তাফা তাকে স্বাগত জানান।

এর পর কানুনী তার যাত্রা অব্যাহত রাখেন এবং হানসাকালে-এরজিশ হয়ে আদিলজেওয়াজে পৌঁছেন। কানুনীর অন্যান্য পাশাগণ পরামর্শ দেন যে, তিনি যেন ভান হয়ে যান। কিন্তু তিনি তাঁদের কথা না শুনে শাহজাদা আলকাস মীর্জার পরামর্শ মোতাবেক তাবরীজে যান। তাবরীজ কোন প্রকার প্রতিরোধ না করেই আত্মসমর্পণ করে। তাবরীজকে হস্তগত করার পর আলকাস মীর্জাকে সেখানের গভর্নর হওয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু আলকাস মীর্জা বলেন, তিনি গভর্নর হলে এখানে হত্যাযজ্ঞ চালাবেন। একথা শুনে কানুনী তাকে আর সেখানের গভর্নর বানাননি। এই সময়ে তাহমাস্পও ভয়ে পালিয়ে যাওয়ায় কানুনী কোন প্রকার প্রতিরোধ ছাড়াই ভানকে করতলগত করেন এবং সেখান দিয়ে দিয়ারবাকিরে যান। ইতিমধ্যে শীতকাল এসে পড়ায় কানুনী ফিরে আসার সিধান্ত নেন। এটা দেখে তাহমাস্প পুনরায় এরজিশ, আহলাত এবং আদিলজেভিজে আক্রমণ করে সেখানে অনেক ধংসযজ্ঞ চালায়। এর পর কারস দুর্গকে দখলকারী তাহমাস্প সেখানে গনহত্যা চালায় এবং সেখান তেরজান এবং এরযিনজানে যাত্রা করে। এটা শুনে কানুনী পুনরায় তার সেনাবাহিনী পাঠালে তাহমাস্প পুনরায় ইরানে ফিরে আসে। অর্থাৎ উসমানী সুলতান তাহমাস্পের সাথে মুখোমুখী না হয়েই ফিরে আসে।

কানুনী ফিরে এসে হালেপে শীতকাল অতিবাহিত করেন। তার ফেরত আসাকে ইরানের শাহ একটি সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে এবং শাহ পুনরায় আক্রমণ করলে ১৫৪৯ সালে তিনি দিয়ারবাকির পর্যন্ত আসেন এবং তার সেনাপতি আহমেদ পাশাকে জর্জিয়া এবং ইরান অভিযানে পাঠান। পরবর্তীকালে তিনি ইস্তানবুলে ফিরে আসেন।

পুনরায় ইরান অভিযান এবং শাহজাদা মুস্তাফার হত্যাকাণ্ড

উসমানী সেনাবাহিনী ইস্তানবুলে ফিরে আসার পরে, ইরানী বাহিনী এরজুরুম পর্যন্ত অনেক জায়গা দখল করে নেয়। ফলশ্রুতিতে কানুনী সুলতান সুলাইমান পুনরায় ইরান অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু এইবার তিনি নিজে না গিয়ে তার নিয়োগকৃত সর্দার রুস্তম পাশাকে সেনাপতি হিসাবে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। এদিকে এরচিশ পর্যন্ত আসা ইরানের শাহ, পুনরায় কুরদিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করতে চান। কিন্তু কুর্দিশ সেনাপতি ইব্রাহীম, শাহকে পুনরায় ইরানে ফিরে যেতে বাধ্য করেন।

রুস্তম পাশা আকসারায় পর্যন্ত এসে, শামসী আগাকে কানুনীর নিকটে পাঠান শাহজাদা মুস্তাফার বিরুদ্ধে নালিশ করতে। বিভিন্ন উৎস থেকে আমরা জানতে পারি যে, সর্দারে আজম রুস্তম পাশা এবং মুস্তাফার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে তাঁদের মধ্যে শত্রুতা ছিল। রুস্তম পাশার ইচ্ছা ছিল, শাহজাদা মুস্তাফা যেন পরবর্তী সুলতান না হয়ে কানুনীর অন্য কোন সন্তান পরবর্তী সুলতান হয়। এর ফলে সে কানুনীর নিকট খবর পাঠায় যে, শাহজাদা মুস্তাফা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সত্যিকারের ঘটনা ছিল, শাহজাদা মুস্তাফার ইচ্ছা ছিল অন্য কোন উজির যেন মূল সেনাপতি না হয়। বরং তাঁদের স্থলে সে নিজে যাওয়ার সংকল্প করে। যারা তাকে পছন্দ করত না তারা তার এই ইচ্ছাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে কানুনীকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করে। কেননা এই ফাসাদকারীগণ চাইত না যে, শাহজাদা মুস্তাফা পরবর্তী সুলতান হোক।

সদরে আজম রুস্তম পাশা কানুনীকে আরও জানায় যে, সৈন্যগণ তাকেই তাঁদের সেনাপতি হিসাবে দেখতে চান। ফলশ্রুতিতে কানুনী সুলতান সুলাইমান ইরান যাত্রা করার লক্ষ্যে ১৫৫৩ সালে ইস্তানবুল থেকে রওনা দেন। তার যাত্রার খবর পেয়ে ইরানের শাহ তাহমাস্প কানুনীর নিকট দূত পাঠিয়ে সন্ধির প্রস্তাব দেয়।

পুত্র শাহজাদা জাহাঙ্গীরকে সঙ্গে নিয়ে কানুনী ইস্তানবুল থেকে যাত্রা করেন। ইয়েনীশেহিরে এসে শাহজাদা বেয়াজিদকে রুমেলিকে রক্ষা করার জন্য দায়িত্ব দেন। কানুনী সুলতান সুলাইমান বলভাদিনে পৌঁছালে তার অপর পুত্র শাহজাদা সেলিম এসে তার সাথে অভিযানে অংশগ্রহণ করতে চাইলে তিনি তাকে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেন। কানুনী এরেলির পর আকতেপে নামক স্থানে আসলে তার বড় পুত্র শাহজাদা মুস্তাফার শিবিরের পাশেই শিবির স্থাপন করেন। পর্দার অন্তরালে যে শাহজাদা মুস্তাফাকে নিয়ে এত কিছু চলছে এই সম্পর্কে শাহজাদা মুস্তাফা কিছুই জানত না। ঘটনা সম্পর্কে তিনি ছিলেন একদমই অনবহিত। তার পিতার তাবু পাশেই একথা জানতে পেরে তিনি তার পিতাকে সালাম করতে তার পিতার তাবুতে যান। কিন্তু তাবুতে ঢুকে তার পিতাকে না পেয়ে, তাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত সাত জন জাল্লাদের মুখোমুখী হোন। শাহজাদা মুস্তাফা এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারেননি। সেখানে তাকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়। শাহজাদা মুস্তাফা যখন এই জল্লাদদের হাত থেকে বাঁচার জন্য জীবনপণ লড়াই করতেছিলেন তখন তার পিতা কানুনী সুলতান সুলেয়মান পর্দার পেছন থেকে এই দৃশ্য দেখতে ছিলেন।

সকল ঐতিহাসিকগণ এই ক্ষেত্রে একমত যে, শাহজাদা মুস্তাফা পাশার এই হত্যাকাণ্ড হুররেম সুলতান এবং রুস্তম পাশার শলাপরামর্শেই হয়েছিল। তাকে হত্যার পরে রুস্তম পাশার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের খবর আসতে থাকে। বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর আসতে থাকে যে, রুস্তম পাশা কানুনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে । এসকল কথা শোনে কানুনী সুলতান সুলেইমান রুস্তম পাশা এবং হায়দার পাশা উভয়ের নিকট থেকে সাদারেত মোহর (seal of Honor) নিয়ে আহমেদ পাশার হাতে তুলে দেন। এর পর কানুনী তার যাত্রাকে অব্যাহত রাখেন এবং শীতকাল চলে আসলে তিনি হালেপে চলে যান। শাহজাদা জাহাঙ্গীর অসুস্থ হয়ে হালেপেই মৃত্যু বরণ করেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, তার বড় ভাই শাহজাদা মুস্ফাফার মৃত্যুর কষ্টকে সহ্য করতে না পেরে দুঃখে কষ্টে অসুস্থ হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বিভিন্ন উৎসমতে, শাহ্জাদা জাহাঙ্গীরের মৃত্যুতে কানুনী খুবই মর্মাহত হোন এবং তার এই শোককে কাটিয়ে উঠার জন্য হামা এবং মা'রাত্তু' উন- নু'মানে নির্বাসনে যান এবং সেখানে গিয়ে বিভিন্ন ধরণের শিকার করেন বলে কথিত আছে। সত্য কেবলমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালাই জানেন।

কানুনী হালেপে কিছুকাল অবস্থান করার পর বসন্তকাল আসার সাথে সাথেই অভিযান শুরু করেন এবং দিয়ারবাকির, এরজুরুম, কারস হয়ে এরিভানা পর্যন্ত যান এবং নাহচিবান ও কারাবাগ অঞ্চলে পূর্ণ শাসন কতৃত্ত্ব স্থাপন করেন।

কানুনী সুলতান সুলেইমান ইস্তানবুল থেকে এরজুরুমে আসলে ইরানের শাহ সন্ধি চুক্তি করার জন্য দূত প্রেরন করেন। কানুনী ইরানের দূতকে সাদরে গ্রহণ করে শান্তি চুক্তি করার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং শাহ এর দূতকে উপহার দিয়ে ফেরত পাঠান। পরে তিনি আমাসিয়াতে এসে সেখানে শীতকাল অতিবাহিত করেন। এই সময়ের মধ্যে রুমেলি বেইলারবেই সকুল্লু মেহমেদ পাশাকে তার উজির নিয়োগ করেন।

কানুনী আমাসিয়ায় অবস্থান কালে ইরানের দূত শাহ এর পক্ষ থেকে অনেক উপঢৌকন নিয়ে শাহ এর চিঠিকে কানুনীর হাতে তুলে দেন। শাহ এই চিঠিতে বলেন যে, তিনি তার সাথে শান্তি চুক্তি করতে চান এবং শিয়ারা যেন হজ্জ করতে পারে এই অনুমতি চান। আমাসিয়ায় সংগঠিত এই চুক্তির মাধ্যমে ২৯ শে মে ১৫৫৫ সালে উসমানী এবং ইরান শত্রুতা নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

উজিরে আজম আহমেদ পাশার ফাঁসী

কানুনী সুলতান সুলেইমান ইস্তানবুল থেকে ফেরার পর, উজিরে আজম আহমেদ পাশার বিরুদ্ধে তার নিকটে অনেক অভিযোগ উপস্থাপন করা হয়। কানুনী অভিযোগ শুনে তাকে ফাঁসী দেওয়ার নির্দেশ দেয় এবং ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। কিন্তু পরে অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, মূলত পাশাদের মধ্যকার

পারস্পারিক দ্বন্দের কারণেই আহমেদ পাশার বিরুদ্ধে কানুনী সুলতান সুলাইমানের নিকটে অভিযোগ উপস্থাপন করে। ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে কানুনীর স্ত্রী হুররেম সুলতান তার জামাতা রুস্তম পাশাকে পুনরায় উজিরে আযম বানানোর জন্য এই ষড়যন্ত্র করে তাকে হত্যা করায়। আগে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে শাহজাদা মুস্তাফাকেও এমন ষড়যন্ত্র করে হত্যা করা হয়েছিল।

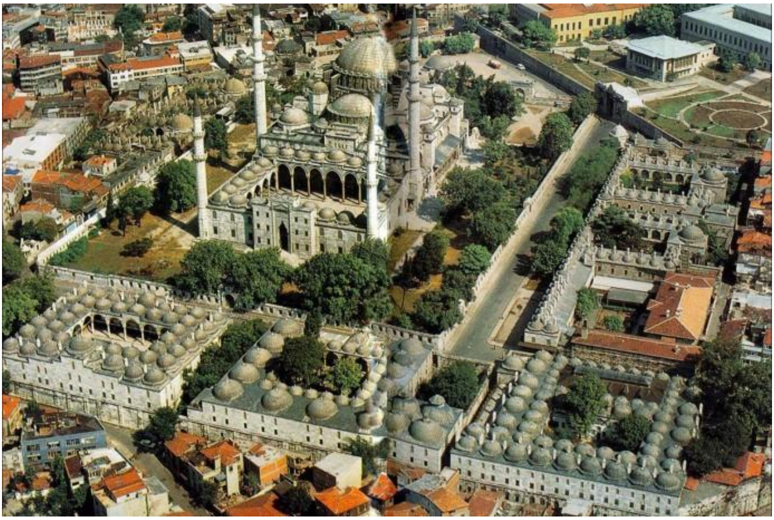

বর্তমান সময়ের সুলেইমানিয়া মসজিদ

সুলেইমানিয়া মসজিদের উদ্বোধন

কানুনী সুলতান সুলাইমান বিখ্যাত মিমার (স্থপতি) সিনানকে অনুরোধ করেন যে তিনি যেন এমন একটি মসজিদ তৈরি করেন যা পৃথিবীর স্থাপত্য বিদ্যার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। মিমার (স্থপতি) সিনানও তার এই কথা শুনে অনেক চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে বিশ্ববিখ্যাত এই সুলেয়মানিয়া মসজিদ নির্মাণ করেন। চারটি মিনার সম্বলিত দৃষ্টিনন্দন এই মসজিদটি ১৬ ই আগস্ট ১৫৫৬ সালে ঝাকজমক পূর্ণ এক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ইবাদতের জন্য উম্মুক্ত করে দেওয়া হয়। মসজিদের উদ্বোধনের পরে মসজিদ কমপ্লেক্সে চারটি মাদরাসা

প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং এর জন্য তিনি যুগশ্রেষ্ঠ আলেমদেরকে এই কাজে নিযুক্ত করেন।

হুররেম সুলতানের মৃত্যু এবং শাহজাদা বায়েজিদের ফাঁসী

কানুনীর সময়ে সবচেয়ে বেশী প্রসাদ ষড়যন্ত্রকারিণী কানুনীর স্ত্রী হুররেম সুলতান ১৫৫৮ সালে মৃত্যু বরণ করে এবং তাকে সুলেয়মানিয়া মসজিদের নিকটস্থ কবরস্থানে দাফন করা হয়। হুররেমের পুত্রদের মধ্যে কেবল বেয়াজিদ ও সেলিম জীবিত ছিলেন এবং তার সৎ পুত্র শাহজাদা মুস্তাফাকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করায়। বেয়াজিদ এবং সেলিম এই দুই ভাই পরবর্তী সুলতান হওয়ার জন্য পারস্পারিক দ্বন্দ সংঘাতে লিপ্ত ছিল। তবে বেয়াজিদ বেশী রুক্ষ মেজাজী হওয়ার কারণে কানুনী সেলিমকে বেশী পছন্দ করত। বেয়াজিদ ছিল কুতাহিয়ার শাসক এবং সেলিম ছিল মানিসার শাসক। পুত্রদের মধ্যকার এই সংঘাত দূর করার জন্য কানুনী সুলতান সুলেইমান তাঁদের জায়গাকে পরিবর্তন করে সেলিমকে কনিয়ার শাসক করে কনিয়া পাঠিয়ে দেন এবং বেয়জিদকে আমাসিয়ার শাসক করে আমাসিয়ার পাঠিয়ে দেন। কিন্তু শাহজাদা বেয়াজিদ এটাকে ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। সে মনে করেছিল যে তার বাবা তাকে মসনদ না দেওয়ার জন্য এই ফন্দি এঁটেছে। এই জন্য সে আমাসিয়ায় না যাওয়ার জন্য বিভিন্ন বাহনা দেখাতে থাকে এবং ধীর গতিতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকে। বেয়াজিদের এই রকমের আচরণে তার পিতা কানুনী সুলতান সুলেইমান ক্ষুব্ধ হতে থাকেন।

কিছু কাল যেতে না যেতেই দুই ভাই একে অপরের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে শুরু করে। বেয়াজিদ তার নিজের ক্ষমতাকে বিস্তার করার জন্য সৈন্য সমাবেশ শুরু করলে সেলিম তার পিতার সহায়তা নিয়ে সৈন্য সমাবেশ শুরু করে। সৈন্য সমাবেশ করার পরে আক্রমনের জন্য আমাসিয়া থেকে যাত্রা শুরু করে। নিজ পুত্রের এমন আচরণের কথা শুনে কানুনী সুলতান সুলাইমান

শায়খুল ইসলাম (প্রধান বিচারপতি) আবুস সুউদ এফেন্দির নিকট থেকে ফতওয়া নিয়ে তার পুত্রের এই বিদ্রোহ ঠেকানোর জন্য সেনাবাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করেন।

ফলশ্রুতিতে শাহজাদা বেয়াজিদ কনিয়াতে তার পিতা এবং ভাইয়ের মুখোমুখী হোন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শাহজাদা বেয়াজিদ ইরানে পালিয়ে যান এবং সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এর পর কানুনী সুলতান সুলেইমান ইরানের শাহ এর নিকটে বড় পরিমানের স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়ে এবং কারসও তাঁদেরকে দিবেন এই শর্তে শাহজাদা বেয়াজিদকে তার নিকটে সমর্পণ করতে বলেন। শাহ প্রথমে বেয়াজিদকে সমর্পণ করতে রাজি না হলেও পরবর্তীতে শাহজাদা বেয়াজিদকে সমর্পণ করতে রাজি হোন। সমর্পণ করতে রাজি হওয়ার পরে কানুনী সুলতান সুলায়মান তাকে ইরান থেকে নিয়ে আসার জন্য একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন।

বেয়াজিদকে ফেরত পাওয়ার পর তাকে ইস্তানবুলেও নিয়ে আসা হয়নি। বরং তাকে নিয়ে আসার পথেই কাজভিনে হত্যা করা হয় এবং সিবাসে নিয়ে এসে তাকে সেখানে দাফন করা হয় (১৫৬২)।

একই বছরে অর্থাৎ ১৫৬২ সালে অষ্ট্রিয়ার সাথে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করা হয়।

অপরদিকে সাগরে উসমানীদের অবস্থান দুর্বল হতে থাকে। কেননা কাপ্তানে দরিয়া বারবারস খাইরুদ্দিন পাশা ১৫৪৬ সালে মৃত্যুবরণ করলে তার শুন্য স্থান পূরণ করার মত যোগ্য কেউ ছিলেন না। সমুদ্রে এত দুর্বলতার পরেও উসমানীগণ মাল্টা দ্বীপে আক্রমণ করেন। কিন্তু পরাজিত হওয়ার পাশাপাশি সাগরবিদ নাবিক তুরগুত রইস এই অভিযানে শাহাদাত বরণ করেন।

জিগেটভার যুদ্ধ

১৫৬২ সালে অষ্ট্রিয়ার সাথে শান্তি চুক্তি হলেও এটা মূলত কাগজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বাস্তবিক দৃষ্টিকোন থেকে উসমানীদের সাথে অষ্ট্রিয়ার সম্পর্ক ভালো ছিল না। বিভিন্ন সীমান্তে এবং হাঙ্গেরী সীমান্তে কিছু সমস্যা ছিল। পূর্বের চুক্তি অনুযায়ী অষ্ট্রিয়া উসমানী খিলাফাতকে যে পরিমানে ভ্যাট দেওয়ার কথা ছিল তা দেয়নি। তাছাড়াও রাজা ফারদিনান্দের মৃত্যুর পরে তার স্থলে আসেন রাজা দ্বিতীয় মাক্সিমিলিয়ান। সে সিংহাসনে আসীন হওয়ার পরেই উসমানী খিলাফাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। এই সময়ে সদরে আজম সেমিজ আলী পাশা মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর সকুল্লু মেহমেদ পাশাকে সদরে আযম হিসাবে নিয়োগ করা হয়।

অষ্ট্রিয়ার এমন আচরণ এবং বিশেষ করে জিগেটভার কেল্লার সীমান্তবর্তী স্থানে উসমানী খিলাফাতের অধ্যুষিত এলাকায় তারা জুলুম নির্যাতন শুরু করে। এই সময়ে কানুনী সুলতান সুলেয়মানের বয়স বেশী হওয়া সত্ত্বেও অষ্ট্রিয়াকে শিক্ষা দেওয়ার অভিযানে তিনি বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। দীর্ঘ ১০ বছর পর্যন্ত কানুনী সুলতান সুলেইমান কোন জিহাদে বের না হওয়ার কারণে তার বিরুদ্ধে সমালোচনা শুরু হয়। এই অভিযানে তিনি নিজে অংশগ্রহন করার পেছনে কারণ হিসাবে এটাকেও ধরা যেতে পারে। তিনি তার এই বৃদ্ধ বয়সে জিহাদে বের হওয়ার পেছনে তার কন্যা মিহরিমাহর উৎসাহ উদ্দীপনাও প্রভাবিত করেছিল বলে বলা হয়ে থাকে।

উসমানী খিলাফাত বৃদ্ধ কানুনী সুলতান সুলেইমানের নেতৃত্বে ১ লা মে ১৫৬৬ সালে ইস্তানবুল থেকে যাত্রা শুরু করে এবং দুই মাস পরে, অর্থাৎ আগস্ট মাসের শুরুতে যিগেটভার কেল্লার সামনে গিয়ে উপস্থিত হোন। উসমানী খিলাফাতের এই অভিযান সম্পর্কে অবহিত হয়ে অস্ট্রিয়ান বাহিনী দুর্গের প্রতিরক্ষাকে ব্যাপকভাবে মযবুত করেন। তারা দুর্গের ভেতরে ব্যাপক অস্ত্র মজুত করে এবং বাহিরে কামান ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র সজ্জিত করে রাখে। এই

জন্য এই অভিযান কঠিন অবস্থার মধ্যে শুরু হয়। এই যুদ্ধ সরাসরি ভাবে কানুনী এবং তার নেতৃত্বে সদরে আজম মেহমেদ পাশা নেতৃত্ব দেন। এই অভিযান এক মাস পর্যন্ত দীর্ঘ হয় এবং ৭ সেপ্টেম্বর বিজয় অর্জিত হয়।

কানুনী সুলতান সুলেইমানের মৃত্যুঃ

কানুনীর বয়স ৭৪ বছর হওয়ার পরেও তিনি ইউরোপের এই অভিযানে বের হোন। বার্ধক্যের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন ধরণের রোগে আক্রান্ত ছিলেন। ৬ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে এই মহান সুলতান জিহাদের চাদরে মৃত্যু বরণ করেন। উজিরে আজম সকুল্লু তার মৃত্যু সংবাদ জানতে পেরেও অভিযানকে সফল করার লক্ষ্যে এবং সেনাবাহিনীর মনোবল চাঙ্গা রাখার জন্য তার মৃত্যু সংবাদকে গোপন করে রাখেন। সকুল্লু মেহমেদ পাশা দারোয়ানদেরকে ডেকে লিখতে নির্দেশ দেন যে, "খলিফার স্বাস্থ্য অবস্থা আগের চেয়ে ভালো, আস্তে আস্তে উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু এত কষ্ট এবং এত ক্ষয়ক্ষতির পরেও এই দুর্গের বিজয় না হওয়ায় তিনি খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং মন মরা। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, আজ যেন এই কেল্লার বিজয় অবশ্যই সংগঠিত হয়"। লেখা শেষ হলে তিনি সবার জ্ঞাতার্থে ঘোষণা করতে বলেন।

উজিরে আজম সকুল্লু মেহমেদ পাশার এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয় এবং সত্যিই কেউ কানুনীর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত হতে পারেনি। একই দিন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁদেরকে বিজয় দান করেন। এইভাবে কানুনী এই মহান বিজয় না দেখেই জিহাদের জন্য যে তাবু নির্মাণ করা হয়েছিল সে তাবুতে মৃত্যু বরণ করেন।

কানুনীর লাশ যেন নষ্ট না হয় এই জন্য তিনি গোপনে ব্যবস্থা গ্রহন করেন এবং তিনি মাঝে মাঝে তাবুতে প্রবেশ করে নির্দেশ আনার মত করে বের হতে থাকেন। যেন সৈন্যগণ বুঝতে না পারে যে এই মহান সুলতান আর এই

পৃথিবীতে নেই। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, কেউ যেন কানুনীর মৃত্যুর খবর জানতে না পারে সেই জন্য তার সেবায় নিয়োজিত ডাক্তারকেও বন্দী করে রাখেন। এমনকি ফেরার সময়েও তিনি এই একই পন্থা অবলম্বন করেন এবং গোপনে শাহজাদা সেলিমকে তার মৃত্যুর খবর দেন এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন।

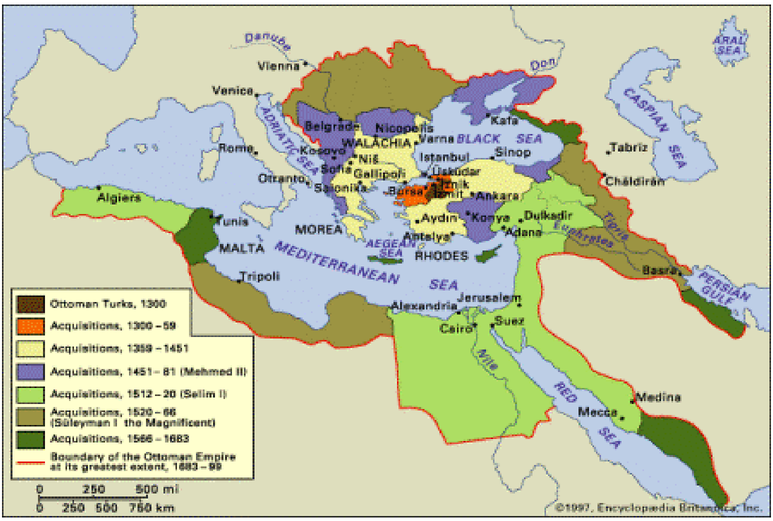

উসমানি খিলাফাতের ১৩০০ সন থেকে ১৬৯৯ পর্যন্ত মানচিত্র

কানুনী সুলতান সুলাইমানের শাসনামলের একটি মূল্যায়নঃ

১- নিঃসন্দেহে কানুনী সুলতান সুলাইমান উসমানী খিলাফাতের সবচেয়ে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং সফল খলিফাদের একজন। তার ৪৬ বছরের শাসনামলে তিনি অনেক অভিযানে বের হয়েছেন এবং এই সকল অভিযানকে তিনি 'জিহাদ' নামে অভিহিত করেছেন।

২- সবসময় তিনি নিজের চেয়ে উম্মাহর এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে বেশী গুরুত্ব দিতেন। মুসলিম উম্মাহ এবং রাষ্ট্রের স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য তিনি যে কোন

ধরণের ত্যাগ স্বীকার করতে দ্বিধা করতেন না। তিনি যে কোন কাজ করার সময় আগে শায়খুল ইসলামের নিকট থেকে ফতওয়া নিতেন এবং কোন কাজ যেন ইসলাম বহির্ভূত না হয় এই জন্য তিনি তার ফতওয়া ও পরামর্শের আলোকে কাজ করতেন। বিশেষ করে শাইখুল ইসলাম (প্রধান বিচারপরতি) আবুস সুউদ এফেন্দিকে তিনি অনেক বেশী শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতেন। তিনি যখনই পবিত্র কোরআনের কোন পারার তাফসীর শেষ করে কানুনীর হাতে তুলে দিতেন তখনই তিনি তা অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভরে গ্রহন করতেন এবং তাকে পুরস্কৃত করতেন। এই ভাবে তিনিই জ্ঞান বিজ্ঞানে ব্যাপক ভাবে অনুপ্রেরণা দান করতেন।

৩- শিয়া ইরান রাষ্ট্র উসমানী খিলাফাতের জন্য কখনো কখনো হুমকি ও সমস্যা সৃষ্টি করায় তার বাবা ইয়াভুজ সুলতান সেলিমের শিয়া ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তিনি তার বাবার পথ ধরে ইরানের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।

৪- উসমানী খিলাফাত স্থাপত্যের উপর অনেক বেশী জোর প্রদান করেছিলেন, এই জন্য তারা অর্থ ব্যয় করতে কোন প্রকার কার্পণ্য করতেন না। মসজিদ, ব্রীজ, পানি পানের স্থান, পানির টানেল, মাদ্রাসার মত অনেক সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনেক চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এখনো সুলেয়মানিয়া মসজিদ এবং ফাউন্ডেশন নামে যে কমপ্লেক্সটি রয়েছে তা কানুনী সুলতান সুলেইমানই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এটা উসমানী খিলাফাতের এক অমর কীর্তি। কানুনী সুলতান সুলাইমানের স্থপতি সিনান এই সকল ব্যতিক্রম ধর্মী স্থাপনাকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এই সকল স্থাপনা ও স্থপতি সিনানকে নিরাশ করেনি। তাকে দিয়ে তাকে ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপতি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তার কীর্তিকে অমর করে রেখেছে। মসজিদের পাশেই তিনি যে মাদরাসা গড়ে তুলেছিলেন সেখান থেকে হাজার হাজার আলেম এবং দায়ী ইলাল্লাহ তৈরি হয়েছে। কানুনী নিজেও একজন কবি ছিলেন তিনি খুব ভালোবাসা নিয়ে তারকিশ এবং ফার্সি ভাষার কবিতা পাঠ

করতেন। তিনি কবি এবং সাহিত্যিকদেরকে অনেক বেশী গুরুত্ব দিতেন। প্রায় সব সময় তার সাথে থাকতেন বিভিন্ন কবি ঐতিহাসিকগণ তারা তাকে বিভিন্ন কবিতা এবং ইতিহাসের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত করতেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মাত্রাকচি নাসুহ।

কানুনী সুলতান সুলাইমান তার পূর্ববর্তীদের মত এবং পরবর্তীদের মত মক্কা এবং মদিনাকে অনেক বেশী গুরুত্বের সাথে দেখতেন। এই জন্য তিনি শায়খুল ইসলাম আবু সুউদ এফেন্দির ফতওয়া নিয়ে কাবা শরীফের সংস্কার সাধন করেন এবং সে এলাকাকে হাজিদের জন্য আরও বেশী শোভা মণ্ডিত করে তুলেন।

৫- কানুন নামা সমূহঃ যা কানুনীকে কানুনী উপাধি এনে দিয়েছে। এই সকল আইনী সংস্কার মূলত শুরু করেছিলেন ফাতিহ সুলতান মেহমেদ। কিন্তু তিনি শেষ করে যেতে পারেননি, পরে তিনি এই সকল আইন কানুনকে পূর্ণতায় রূপ দেন। মূলত আইন তৈরি করতেন সুলতান গণ। কিন্তু সেটা ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা এই ব্যাপারে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতেন আলেম উলামাগণ, যদি তারা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে অনুমোদন দিতেন তখন সেটা প্রয়োগ করতেন।

৬-কানুনী সুলতান সুলাইমান দ্বিগবিজয়ী একজন সেনাপতি ছিলেন। আপনারা আমাদের আগের বর্ণনা সমূহ থেকে যেমনটি জানতে পেরেছেন। তিনি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে অনেক বেশী অভিযান পরচালনা করেছিলেন এমন কি ভিয়েনাকে বিজয় করার জন্য তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এই জন্য পাশ্চাত্যের সাহিত্যে তাকে "Suleiman the Magnificent" নামে অভিহিত করা হয়।

৭- কানুনী সুলতান সুলাইমান সকলের মতই একজন রক্ত মাংসে গড়া মানুষ ছিলেন। মানুষ অবশ্যই ভুল করে থাকে। কেননা কোন মানুষ ভুল এবং ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। এই জন্য কানুনীও জেনে না জেনে ভুল ভ্রান্তি করেছিলেন।

বিশেষ করে শাহজাদাদেরকে হত্যা করার পরিবর্তে যদি তাঁদেরকে রাজ প্রাসাদে অবস্থিত কাফেস নামক জেলে রাখতেন তাহলে বেশী ভালো হত।

“যে তার অতীত জানে না, সে তার ভবিষ্যৎ ও জানে না।
তুমি তোমার অতীতকে ভাল করে জানো, যেন ভবিষ্যতে
মজবুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারো। কোথা থেকে এসেছ
তা ভুলে যেও না, কোথায় যেতে হবে তাও ভুলে যেও না”

-শেখ এদেব আলি (উসমানী খিলাফাতের প্রতিষ্ঠাতা উসমান গাজীর উস্তাদ)